মাতৃভাবানুরঞ্জিতা ভারতীপ্রাণা

গৌরী ভৌমিক

স্বামী বিবেকানন্দ চেয়েছিলেন শ্রীশ্রীমাকে কেন্দ্র করে ভারতে নারীশক্তির জাগরণ। শ্রীশ্রীঠাকুরও তাঁর আরব্ধ কাজের ভার সমর্পণ করেছিলেন শ্রীশ্রীমাকে এবং তার জন্য তাঁকে তিল তিল করে প্রস্তুত করেছিলেন। সর্বসিদ্ধিদাত্রী মহাশক্তির বোধন সাধন করেছিলেন তাঁর মধ্যে। শ্রীশ্রীমা বলতেন, ''ঠাকুরের জগতের প্রত্যেকের ওপর মাতৃভাব ছিল। সেই মাতৃভাব জগতে বিকাশের জন্য এবার আমাকে রেখে গেছেন।''[১] এই মাতৃভাবের বিকাশকে সর্বাঙ্গীণ রূপ দিতে স্বামীজীর স্বপ্ন ছিল শ্রীশ্রীমাকে কেন্দ্র করে গঙ্গার পূর্বতটে শ্রীরামকৃষ্ণ মঠের অনুরূপ মেয়েদের জন্য একটি পৃথক মঠ স্থাপন করা। নিজের অভিপ্রায় ব্যক্ত করেছেন শিষ্যের কাছে : ''এ মঠে যেমন ব্রহ্মচারী সাধু—সব তৈরি হবে, ওপারে মেয়েদের মঠেও তেমনি ব্রহ্মচারিণী সাধ্বী—সব তৈরি হবে।[২]... যারা চিরকুমারী ব্রত অবলম্বন করবে, তারাই কালে এই মঠের শিক্ষয়িত্রী ও প্রচারিকা হয়ে দাঁড়াবে।... চরিত্রবতী, ধর্মভাবাপন্না ওইরূপ প্রচারিকাদের দ্বারা দেশে যথার্থ স্ত্রীশিক্ষার বিস্তার হবে। ধর্মপরায়ণতা, ত্যাগ ও সংযম এখানকার ছাত্রীদের অলংকার হবে; আর সেবাধর্ম তাদের জীবনব্রত হবে।''[৩]

শ্রীশ্রীঠাকুরের লীলাসংবরণের পর দীর্ঘ চৌত্রিশ বছর গুরুরূপে, মাতৃরূপে, সঙ্ঘজননীরূপে শ্রীশ্রীমা শ্রীশ্রীঠাকুর কর্তৃক সমর্পিত দায়ভার বহন করেছেন এবং শরীরত্যাগের আগে নিজের হাতে গড়ে রেখে গেছেন তাঁর যোগ্য উত্তরসূরী। তাঁর প্রাত্যহিক যাপনে, লোকব্যবহারে, ঈশ্বরমুখিতা ও আধ্যাত্মিক ভাবতন্ময়তায় আদর্শ জীবনের যে একটি অনুপম চিত্র নির্মিত হয়েছে তা যেন ভারতবর্ষের সনাতন ও আধুনিক জীবনাদর্শের মধ্যে এক সেতুস্বরূপ হয়ে আছে। কখনও তিনি প্রতিভাত হন 'একটি পুরাতন আদর্শের শেষ প্রতিনিধি'রূপে, আবার কখনও মনে হয় তিনি যেন 'কোনও নতুন আদর্শের অগ্রদূত'। তাঁকে কেন্দ্র করে যে একটি পরিমণ্ডল গড়ে উঠেছিল, সেখানে যে-নারীরা এসেছেন, তাঁরাও ভগবৎপরায়ণতা, ত্যাগ ও বৈরাগ্যে উদ্দীপিত হওয়ার পাশাপাশি হয়ে উঠেছিলেন মানবকল্যাণের দিশানুসন্ধানী। এঁদের মধ্যে যেমন ছিলেন সংসারতাপদগ্ধা কুলনারী, তেমনি ছিলেন অনাঘ্রাত কুসুমকলির মতো কুমারী কন্যাও—ঠাকুর যেমন বলতেন, খোলা থেকে ছিটকে বাইরে পড়া খই—নিদাগ শুভ্র। এমনই একটি কলি বালিকা পারুল, শ্রীশ্রীমার সেবিকারূপে সরলা এবং পরবর্তী কালে

গুরুপূর্ণিমা, ১৯৬৮

ব্রহ্মবাদিনী প্রব্রাজিকা ভারতীপ্রাণা।

শ্রীশ্রীমার সান্নিধ্যে ও শিক্ষায় সরলার জীবন গড়ে উঠেছিল। তাঁর সম্বন্ধে মা বলতেন, ''ওইটি আমার কোলের মেয়ে।'' ১৯১৩ সালে শ্রীশ্রীমা স্বয়ং তাঁকে সেবাধিকার প্রদান করে নিজের কাছে নিয়ে আসেন। কিন্তু কয়েকমাস পরেই তিনি লেডি ডাফরিন হাসপাতালে নার্সিং শেখার সুযোগ পেয়ে হস্টেলে চলে যান। ফিরে এসে ১৯১৮ সাল থেকে শ্রীশ্রীমায়ের মর্ত্যলীলার অন্তিমক্ষণ পর্যন্ত সরলা তাঁর সেবায় নিযুক্ত ছিলেন। শ্রীশ্রীমা অপ্রকট হলে তিনি শরৎ মহারাজের নির্দেশমতো কয়েক বৎসর কাটান। ১৯২৭ সালে শরৎ মহারাজ লোকান্তরিত হলে সরলা কাশীধামে চলে যান। সেখানে নিভৃত সাধনায় অতিবাহিত করেন দীর্ঘ সাতাশ বছর। যে-মহত্তর জীবনের বীজ তিনি লাভ করেছিলেন শ্রীশ্রীমায়ের কাছে, এই সুদীর্ঘ সাধনকালে তা যেন ফলিত পুষ্পিত হয়ে উঠেছিল। ১৯৫৪ সালে শ্রীশ্রীমার জন্মশতবর্ষে স্বামীজীর স্বপ্নের স্ত্রীমঠ শ্রীসারদা মঠ প্রতিষ্ঠিত হলে সকলের অনুরোধে এবং সঙ্ঘগুরু স্বামী শঙ্করানন্দজীর নির্দেশে তাঁর কাশীবাসের পরিসমাপ্তি ঘটে। শ্রীসারদা মঠের প্রথম অধ্যক্ষার পদে বৃত হন শ্রীশ্রীমার ভাবসম্বলিত জীবন্ত প্রতিমা সরলা। তখন তিনি প্রব্রাজিকা ভারতীপ্রাণা।

শ্রীশ্রীমায়ের জীবন সরলাকে শিখিয়েছিল সর্বাবস্থায় ঈশ্বরপরায়ণ, অনাড়ম্বর ও নিরহংকার হতে। শ্রীশ্রীঠাকুরের সান্নিধ্যে যেমন দিব্য আনন্দের পূর্ণঘট শ্রীশ্রীমার হৃদয়মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, তেমনি শ্রীশ্রীমার দিব্য সান্নিধ্যের দুটি বছর সরলার জীবনকেও কানায় কানায় পূর্ণ করেছিল। মায়ের সেবা, পরিচর্যা ও সান্নিধ্যে যে-আনন্দে সরলার দিনগুলি অতিবাহিত হয়েছিল, কাশীবাসের প্রখর কৃচ্ছ্রসাধনের দিনগুলিতেও তা তেমনি অমলিন ছিল। আর শ্রীসারদা মঠের 'মা' হয়ে তা যে শতধা প্রবাহিত হয়ে সকলের হৃদয়কে স্পর্শ করেছিল, তা তাঁর সান্নিধ্যসুখসেবী সন্ন্যাসিনী ও ভক্তদের স্মৃতিচারণায় স্পষ্ট।

শ্রীরামকৃষ্ণ বলতেন, ''যে যার চিন্তা করে, সে তার সত্তা পায়।'' অবিরত মাতৃঅনুধ্যানের ফলে ভারতীপ্রাণাজীও তা-ই হয়ে উঠেছিলেন। যাঁরা তাঁকে প্রত্যক্ষ করেছেন তাঁরা অনুভব করেছেন, তাঁর মানুষী প্রতিমায় স্বয়ং শ্রীশ্রীমা বিরাজিতা। শ্রীশ্রীঠাকুর মাকে শিখিয়েছিলেন—মা নিজেও বলতেন—যেখানে যেমন সেখানে তেমন, যখন যেমন তখন তেমন, যাকে যেমন তাকে তেমন। সরলা দেখেছেন, কত অনায়াসে শ্রীশ্রীমা সব পরিবেশে নিজেকে মানিয়ে নিতেন। তিনি দেখেছেন শহরের অন্দরমহলের ঘেরাটোপে স্ত্রী-পুরুষ নানা ভক্তের সমাবেশে অবগুণ্ঠিতা, লৌকিকতা ও সৌজন্যের বিধিনিষেধের দ্বারা পরিবেষ্টিতা মাকে, আবার জয়রামবাটী বা কোয়ালপাড়ায় স্নিগ্ধ গ্রাম্য পরিবেশে

পল্লীবালারূপিণী সহজ মাকে, আবার দেখেছেন আত্মীয়-পরিজন পরিবেষ্টিত শ্রীশ্রীমার সংসারযন্ত্রণা সহনের দিকটিও। অথচ সর্বাবস্থায় সতত ভগবন্মুখী, ভগবৎসেবা ও ভক্তসেবায় নিরলস। শ্রীশ্রীমায়ের সকল ভাব ও মাধুর্য সরলার মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হয়েছিল একেবারে অনায়াসে—নবকিশলয়ে সূর্যালোকের মতোই। সঙ্ঘজীবনে তার প্রতিফলন মুগ্ধ করত সাধু-ভক্ত সকলকেই। দক্ষিণভারত ভ্রমণকালের একটি ঘটনা তাঁর স্মৃতিকথা থেকে চয়ন করা যায়। রামেশ্বরে কোনও মঠাধীশ গেলে তাঁকে 'টেম্পল অনার' দেওয়া রীতি, ভারতীপ্রাণাজীকেও সেখানকার পুরোহিত যথোচিত সম্মান জানালেন। কিন্তু সেখানে তাঁদের খাওয়াদাওয়ার ব্যবস্থা ছিল হোটেলে সাধারণের সঙ্গে অপরিচ্ছন্ন পরিবেশে। তাঁর সঙ্গিনীরা কিঞ্চিৎ দ্বিধান্বিত ও বিরক্ত। কিন্তু স্থিরপ্রজ্ঞার অধিকারিণী ভারতীপ্রাণাজী যেমন অনুচ্ছ্বাস শান্তভাবে 'টেম্পল অনার' গ্রহণ করেছিলেন, সেই একই নির্লিপ্ততায় ইষ্টকে স্মরণ করে টেবিলে গিয়ে বসলেন ও প্রসন্নমুখে আহার গ্রহণ করলেন।

শ্রীশ্রীমায়ের আধ্যাত্মিক ভাবসম্পদেরও উত্তরাধিকারিণী ছিলেন ভারতীপ্রাণাজী। শ্রীশ্রীঠাকুরকে প্রত্যক্ষ উপস্থিত জেনে তাঁর সেবাপূজাদি অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে করতেন এবং সকলকে তেমনটি করার শিক্ষা দিতেন। শ্রীশ্রীমায়ের পূজা সম্পর্কে স্বামী গম্ভীরানন্দজী লিখেছেন, ''পূজাকালে মায়ের প্রত্যেক আচরণে মনে হইত, তিনি যেন ঠাকুরকে সম্মুখে উপস্থিত দেখিয়া তাঁহার সহিত তদনুরূপ সপ্রেম ব্যবহার করিতেছেন। সেই প্রেমই তাঁহার পূজাকে রূপ প্রদান করিত। বৈধী ভক্তির সেখানে কিছুই ছিল না।''[৪] সেবিকা সরলাকেও মা অনুরূপ শিক্ষা দিয়েছেন। একদিন তাকে শ্রীশ্রীঠাকুরকে ভোগ নিবেদনের ভার দেন। কিন্তু উপযুক্ত মন্ত্রাদি জানা না থাকায় সরলা দ্বিধান্বিত। শ্রীশ্রীমার অনবদ্য পূজাপদ্ধতি তাঁর স্বমুখে ব্যক্ত হল : ''দেখো মা, ঠাকুরকে আপনার ভেবে বলবে, 'এসো, বসো, নাও, খাও।' আর ভাববে তিনি এসেছেন, বসেছেন, খাচ্ছেন। আপনার লোকের কাছে কি মন্ত্রতন্ত্র লাগে?... তাঁকে যেমনভাবে দেবে, তেমনিভাবেই নেবেন।''[৫] এরপর মা সরলাকে ভোগ-নিবেদনের বৈধী মন্ত্রও বলে দেন। শ্রীশ্রীমার এই কথাগুলি সরলার অন্তরের অন্তঃস্থলে খোদিত হয়ে গিয়েছিল। নিজে যেমন শ্রীশ্রীঠাকুরের নিত্য উপস্থিতি অনুভব করতেন, অপরকেও তদনুরূপ শিক্ষা দিতেন। অসাবধানে বাসনপত্র বা দরজা-জানালায় শব্দ হলে অসন্তুষ্ট হতেন। স্নেহের সুরে বুঝিয়ে বলতেন, ''ওইখানে (ঠাকুরঘরের দিকে নির্দেশ করে) ঠাকুর, মা, স্বামীজী বসে আছেন। সাবধানে ঠাকুরঘরে কাজ করবে, যেন ওঁরা বিরক্ত না হন।''[৬] ধীর, স্থির, শান্ত হতে বলতেন। নিজের হাতে ফল কেটে নৈবেদ্যের থালা সাজাতেন। ফল কাটার সময় যত্ন করে ফল কেটে ছোট ছোট টুকরো করতে বলতেন, যাতে ঠাকুরের

খেতে সুবিধে হয়। ধুনো দেওয়ার সময় ধোঁয়া যেন ঠাকুরের মুখে না লাগে, টেবিল ল্যাম্পের তীব্র আলো তাঁর মুখে যেন না পড়ে। কোনওদিন ঠান্ডা বেশি পড়লে ভোরবেলা ঠাকুরের চাদর গলা পর্যন্ত টেনে দিতে বলতেন, যাতে তাঁর ঠান্ডা না লাগে। ভোগনিবেদনের পর শ্রীশ্রীঠাকুরের স্পৃষ্ট জ্ঞান করে আসনটি মাথায় ঠেকাতেন।

শ্রীশ্রীঠাকুরের অমোঘ শিক্ষার অনুরণন শ্রীশ্রীমার মধ্যে। বলতেন, ''সংসারে কতরকম লোক থাকে। সব সহ্য করে থাকতে হয়। ঠাকুর বলতেন, শ,ষ,স,—তিনটে স। যে সয় সেই রয়।''[৭] কথাগুলি সরলার জীবনের তারগুলিকে নিখুঁত সুরে বেঁধেছিল। শ্রীশ্রীমা বলতেন, সন্তোষের সমান ধন নেই। সেই দুর্লভ ধনের উত্তরাধিকার শ্রীশ্রীমা সঁপেছিলেন তাঁর এই কন্যাটিকে। তাঁর দীর্ঘ জীবনে যেখানে যে-অবস্থাতেই থেকেছেন তাঁর তুষ্টির কোনও অভাব ঘটেনি। কাশীবাসের দিনগুলিতে নানা অসুবিধার মধ্যে দিন গুজরান হত। সম্বল বলতে শরৎ মহারাজের ব্যবস্থাপনায় বরাদ্দ কয়েকটি টাকা। দীর্ঘদিন থাকবার জায়গা ছিল অনিশ্চিত। কিন্তু তাতে তাঁর জপধ্যানে কোনও বিঘ্ন ঘটত না। নিয়মিত গঙ্গাস্নান, পুজোপাঠ, বিশ্বনাথ দর্শন করতেন। তিনি যে মাকে দেখেছেন নানা কাজকর্মের ভিড়ে শারীরিক অসুস্থতা সত্ত্বেও ভক্তের কল্যাণে প্রতিদিন লক্ষ জপ করতে! নিয়ত মাতৃ-অনুধ্যানে মগ্ন থেকেও কোনওদিন মালায় জপ বাদ পড়লে অস্থির হতেন ভারতীপ্রাণা-মাতাজী। বলতেন, ''নিষ্ঠার প্রয়োজন সকলেরই আছে।'' নিজের নিত্যব্যবহার্য জিনিসপত্র সুন্দর করে গুছিয়ে রাখতেন। গামছাখানি কেচে নিজে পরিপাটি করে মেলতেন। এ-ব্যাপারে কেউ তাঁর প্রশংসা করলে বলতেন, ''হবে না, গুছুনির কাছে ছিলুম যে!'' বাস্তবিকই, ঝাঁটাখানিও ব্যবহারের পর সেটিকে উপযুক্ত স্থানে উপযুক্ত সম্মানের সঙ্গে রাখার ব্যাপারে শ্রীশ্রীমার বক্তব্য সর্বজনবিদিত।

শ্রীশ্রীমার কাছ থেকে সরলা নিয়েছিলেন অনাড়ম্বর জীবনের পাঠ। শ্রীশ্রীমার মতো তিনিও কখনও ছাতা, জুতো ইত্যাদি ব্যবহার করেননি। প্রখর গ্রীষ্মে খালি পায়ে অনায়াসে পথ চলতেন ঠাকুরের নাম করতে করতে। স্মৃতিচারণ করতেন, উদ্বোধনে থাকাকালীন একটা ভাঙা চিরুনি দিয়ে মা থেকে শুরু করে রাধু, মাকু, তিনি সকলেই চুল আঁচড়াতেন। কেউ যদি নতুন একটির প্রয়োজনীয়তার কথা বলত, শ্রীশ্রীমা হেসে বলতেন, কাজ তো চলে যাচ্ছে!

এই শিক্ষায় শিক্ষিতা সরলা যখন পরবর্তী কালে মঠাধ্যক্ষা, তখনও নিত্যব্যবহার্য জিনিসপত্র চলনসই হলেই হত। অহেতুক জিনিস বাড়ানো পছন্দ করতেন না। প্রচণ্ড গরমেও নিজের তিনতলার ছোট ঘরটিতে ফ্যান ব্যবহার করতেন না। অনেক বুঝিয়ে একটা ছোট ফ্যান লাগানো হলেও নিজের জন্য সেটা কখনই ব্যবহার করেননি। শ্রীশ্রীমার কাছে যখন তিনি ছিলেন তখন ঠাকুরসেবা, ভক্তসেবা, আত্মীয়সেবা ও অন্যান্য খাতে ব্যয়ের অনুপাতে আয় ছিল কম। শ্রীশ্রীমাকে অনেক হিসেব করে চলতে হত। সেকথা স্মরণ করে ভারতীপ্রাণাজী বলতেন, ''আমি ভিখারিনির মেয়ে।'' বলা বাহুল্য, তাঁর এই স্বীকারোক্তির মধ্যে প্রচ্ছন্ন থাকত মাতৃসান্নিধ্যের সুখানুভূতি।

শ্রীশ্রীমার মধ্যে আমরা বারবার দেখেছি 'যুগোপযোগী সংস্কারমুক্ত উদারতার প্রকাশ'। তিনি মনেপ্রাণে চাইতেন লেখাপড়া শিখে মেয়েরা আদর্শ জীবনের অধিকারিণী হয়ে উঠুক। ব্রাহ্মণকন্যা সরলার নার্সিং শেখার প্রস্তাবে যখন অনেকেই আপত্তি জানিয়েছেন, বিশেষত গোলাপ মা, তখন প্রখর বাস্তবদৃষ্টির অধিকারিণী শ্রীশ্রীমা বলেছেন, ''সে কি গোলাপ, শিখে এসে ও আমাদেরই সেবা করবে।'' সে-সময় ভদ্রঘরের প্রশিক্ষিত সেবিকার

অভাব ছিল, শ্রীশ্রীমা তাই সরলাকে আন্তরিক সমর্থন জানিয়েছিলেন। নার্সিং শিখে সরলা শুধু শ্রীশ্রীমা, গোলাপ মা, যোগীন মার সেবাই করেননি, বহু সম্ভ্রান্ত ভক্তমহিলাও তাঁর সেবালাভে ধন্য হয়েছেন।

শ্রীশ্রীমার মতো ভারতীপ্রাণাজীও যেকোনও বিষয়কে এইভাবে প্রায়োগিক কুশলতার দিক থেকে বিচার করতেন। সংস্কারমুক্ত উদার মন নিয়ে যুক্তিপূর্ণ সহজ মীমাংসা দিতেন। পাড়া-প্রতিবেশী ভক্ত মেয়েদের নানা দুঃখকষ্টের কাহিনি মন দিয়ে শুনতেন ও উপযুক্ত পরামর্শ দিতেন। কেউ পণ দিয়ে কন্যার বিবাহের ব্যবস্থা করলে অসন্তোষ ব্যক্ত করতেন। সংসারে নির্যাতিতা বহু মেয়েকে তিনি সহানুভূতি ও অর্থ দিয়ে সাহায্য করেছেন। এ যেন জয়রামবাটীর অঙ্গনে শ্রীশ্রীমায়েরই ছবি।

উপপতি কর্তৃক পরিত্যক্তা একটি মেয়ে একবার কোয়ালপাড়ায় শ্রীশ্রীমায়ের কাছে এসে কান্নাকাটি করলে শ্রীশ্রীমা সেই পুরুষটিকে ডেকে তারই জন্য কুলত্যাগিনী অসহায় মেয়েটির উপর অবিচারের জন্য তাকে ভর্ৎসনা করেন এবং মেয়েটিকে তার সঙ্গে ফেরত পাঠান। মেয়েটির স্খলনের জন্য মা তাকে দোষ দিলেন না। এক্ষেত্রে নৈতিকতার মাপকাঠিতে ন্যায়-অন্যায় বিচারের চেয়ে মেয়েটির অবশিষ্ট জীবনের নিরাপত্তাই তাঁর কাছে অগ্রাধিকার পেয়েছিল।

আধ্যাত্মিক জীবনাচরণ ও উপাসনাদির ক্ষেত্রেও ভারতীপ্রাণাজী খুঁটিনাটি বাছবিচারগুলি এড়িয়ে চলতেন। শ্রীশ্রীমায়ের মতো তিনিও চিরাচরিত পূজাপদ্ধতির বদলে ব্যাকুলতা ও আত্মনিবেদনকেই প্রাধান্য দিতেন। শ্রীশ্রীমা তাঁকে মন্ত্রদীক্ষা দিয়ে শ্রীশ্রীঠাকুরের ছবি দেখিয়ে বলেছিলেন, ''ইনিই তোমার সর্বস্ব। এঁকে ডেকো, তাহলেই তোমার সব হবে।''[৮] জপ করার পদ্ধতি বিষয়ে বলেছিলেন, ''যেমনভাবে করবে, তেমনিভাবেই হবে, ঠাকুরকে সর্বদা আপনার ভাববে।''[৯] উত্তরকালে সঙ্ঘগুরুরূপে ভারতীপ্রাণাজী ভক্তদের অনুরূপ শিক্ষাই দিতেন। জপধ্যানে জোর দিতে বলতেন শ্রীশ্রীমাকে উদ্ধৃত করে : ''যার আছে সে মাপো, যার নেই সে জপো।'' আবার বলতেন, ''ভ্রমিয়ে বারো, ঘরে বসে তেরো, যদি করতে পারো।'' অর্থাৎ ভ্রমণ করলে যে-ফল পাবে, এক জায়গায় বসে মন লাগিয়ে ধ্যানজপ করলে তার চেয়ে বেশি ফল পাবে।[১০]

শ্রীশ্রীমা ভক্তদের মনে সর্বদা এই দৃঢ়ভাব অঙ্কিত করে দিতেন যে, ''ঠাকুরই সব—তিনিই গুরু, তিনিই ইষ্ট।'' সুধীরাদি সরলাকে পত্রে লিখতেন, ''শ্রীশ্রীঠাকুরই তোমার একমাত্র আপনার। কেবলমাত্র তাঁরই উপর নির্ভর করবে—আর কোনও কিছু অবলম্বন করো না।'' পারুল থেকে প্রব্রাজিকা ভারতীপ্রাণায় উত্তরণের সুকঠিন পথটি সহজ হয়েছিল শ্রীশ্রীঠাকুরের ওপর তাঁর একান্ত নির্ভরতা থেকেই। আশ্রমবাসিনী ও সংসারী সকল ভক্তকে এই 'নির্ভরতা' নামক পরম আশ্রয়েরই সন্ধান দিতেন তিনি। একবার এক প্রবাসী দীক্ষিত ভক্ত মেয়ে প্রথম

চেন্নাইয়ে ভক্তদের সঙ্গে মাতাজী, ১৯৬৫

গর্ভ নষ্ট হওয়ার পর দ্বিতীয়বার গর্ভবতী হলে তার এক আত্মীয়া তার কল্যাণের জন্য যজ্ঞ করার অনুমতি চেয়ে মাতাজীকে চিঠি লেখেন। মাতাজী তাকে উত্তরে লেখেন, ''আমি যজ্ঞ করার প্রয়োজন আছে বলে মনে করি না। ও (মেয়েটি) শ্রীশ্রীঠাকুরের পবিত্র নাম পেয়েছে। সেই নাম জপ ও শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে প্রার্থনা করলে তাঁর কৃপাতেই সব ঠিক হয়ে যাবে।'' বলা বাহুল্য, এভাবেই মেয়েটি বিপন্মুক্ত হয়েছিল। ভারতীপ্রাণাজী মনেপ্রাণে বিশ্বাস করতেন, শ্রীশ্রীমা তাঁর ত্যাগী সন্তানদের জন্য আকুল হৃদয়ে একটু মাথা গোঁজার ঠাঁই প্রার্থনা করেছিলেন বলেই বেলুড় মঠ, শ্রীসারদা মঠ—সব হয়েছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর বলতেন, ''অদ্বৈত জ্ঞান আঁচলে বেঁধে যেখানে ইচ্ছা যাও।'' শ্রীশ্রীমা তাঁর আত্মীয়-পরিজনের সঙ্গে ভক্ত-ভগবানের সংসারে নৈমিত্তিক কর্মপ্রবাহের মধ্যে অদ্বৈতজ্ঞানে পূর্ণ প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। তাই নির্দ্বিধায় জিজ্ঞাসু ভক্তকে বলেছিলেন, ''ঠাকুর পূর্ণ অদ্বৈত ছিলেন এবং অদ্বৈত প্রচার করতেন।'' কাজেই তাঁর সন্তানরাও অদ্বৈতী। অন্তিমকালে তিনি নিজেও মায়াময় সংসার থেকে মন একেবারে তুলে নিয়েছেন। তাঁর অন্তিম বাণী : ''কেউ পর নয় মা, জগৎ তোমার'', অর্থাৎ সেই 'সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম'। এই একই অনুভূতির প্রকাশ অন্তিমকালে ভারতীপ্রাণাজীর শ্রীমুখনিঃসৃত সকলের কল্যাণপ্রার্থনায় : ''সকলের মঙ্গল হোক, সকলের অবিদ্যা দূর হোক, অহং ব্রহ্মাস্মি, ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা।'' মাতৃভাবময়ী মাতাজী শেষ পর্যন্ত মা-সন্তানের দ্বৈতভাবের রেখাটুকুও মুছে দিয়ে প্রবিষ্ট হয়েছেন পূর্ণ অদ্বৈতে।

একবার মহাপুরুষ মহারাজকে ভারতীপ্রাণাজী প্রণাম করতে গেলে তিনি বলেছিলেন, ''সরলা তোমার... এই দুটি হাত মহাশক্তির সেবা করেছে, আমাকে দিয়ে দাও, আমি সোনার ফ্রেমে বাঁধিয়ে রাখব।''[১১] এই হাতে তিনি বহন করতেন শ্রীশ্রীমায়ের আশীর্বাদ। স্বামী মাধবানন্দজী বলতেন মঠবাসিনীদের : ''মা ঠাকরুণের অন্তরঙ্গ সেবিকা! এ কি কম কথা! তোমরা কখনই তাঁকে সামান্য মনে করবে না।'' শ্রীশ্রীমাকে তাঁরা দেখেননি। কিন্তু দেখেছেন মা ভারতীপ্রাণাকে। তিনি বলতেন, ''বড় বড় কথা বলে কি হবে? জীবন দেখাও।'' মাত্র কিছুদিন আগে তাঁর সেই জীবন যাঁরা প্রত্যক্ষ করেছেন তাঁরা দেখেছেন পূর্ণ শরণাগতির সঙ্গে মাতৃভাবের অনুপম অভিব্যক্তি। আর বিস্মিত হয়েছেন এই ভেবে : ''এইজন্যই কি শ্রীশ্রীমা শরৎ মহারাজ ওঁকে নির্জনে তৈরি করেছিলেন, যেমন নাকি মাখন তুলতে গেলে নিভৃতে, নিরালায় সূর্যোদয়ের আগে তুলে নিতে হয়?''[১২]

সহায়ক গ্রন্থ

সম্পাদিকা : প্রব্রাজিকা নির্ভয়প্রাণা, *ভারতীপ্রাণা স্মৃতিকথা* (শ্রীসারদা মঠ : কলকাতা, ১৯৯৫)

তথ্যসূত্র

১। স্বামী গম্ভীরানন্দ, *শ্রীমা সারদাদেবী* (উদ্বোধন কার্যালয় : কলকাতা, ২০০১), পৃঃ ৯৮৮ [এরপর, *শ্রীমা সারদাদেবী*]
২। *স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা* (উদ্বোধন কার্যালয়, ২০০২), পৃঃ ১২৬
৩। তদেব, পৃঃ ১২৮
৪। *শ্রীমা সারদাদেবী*, পৃঃ ৩৪৫
৫। সম্পাদিকা : প্রব্রাজিকা বেদান্তপ্রাণা, *জন্মজন্মান্তরের মা* (শ্রীসারদা মঠ : কলকাতা, ২০০৭), পৃঃ ১৬৩
৬। *ভারতীপ্রাণা স্মৃতিকথা*, পৃঃ ১৮৮
৭। *শ্রীশ্রীমায়ের কথা* (উদ্বোধন কার্যালয়, ১৯৯৫), পৃঃ ৩০৫
৮। তদেব, পৃঃ ৩০৭ ৯। তদেব, পৃঃ ৩১৯
১০। *ভারতীপ্রাণা স্মৃতিকথা*, পৃঃ ১৬১
১১। তদেব, পৃঃ ১৬৩ ১২। তদেব, পৃঃ ১৭৩